॥ ৫ ॥

চণ্ডীদাস

[ক]

পদাবলীকার চণ্ডীদাস মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভাবে ও ভাষায় এক অনন্য কবিব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের বিতর্ক এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি। তবে একথা আমরা স্পষ্টভাবেই বলতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীকার চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নন। আবার পদাবলীকার চণ্ডীদাসও এক ব্যক্তি, না কি বহু ব্যক্তি, তা নিয়েও নানা মত আছে। তবে এ কথা ঠিক যে, চৈতন্যদেবের আগে একজন চণ্ডীদাসকে পাওয়া যাচ্ছে, এবং চৈতন্য-পরবর্তী যুগে পাওয়া যাচ্ছে দীন চণ্ডীদাস এবং সহজিয়া চণ্ডীদাসকে। আমাদের আলোচনায় চণ্ডীদাসের পদ বলতে প্রধানত চৈতন্যপূর্ব চণ্ডীদাসকেই আমরা বুঝেছি। তবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলনে এমন দু-একটি চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ আছে যা বহু ব্যবহারে চণ্ডীদাসের নামে চলে এলেও সেগুলি চৈতন্যপূর্ব কবি চণ্ডীদাসের পদ হিসেবে নিঃসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণের উপযুক্ত নয়। আমরা যথাস্থানে সেই সন্দেহের কথা উল্লেখ করেই চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে যেগুলি চৈতন্যপূর্ব পদাবলীকার চণ্ডীদাসের পদ বলে গ্রহণ করা যায় সেইসব পদগুলিকে ভিত্তি করে চণ্ডীদাসের কবি-ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের চেষ্টা করব।

চণ্ডীদাস সহজতম ভাষায় প্রেমের গভীরতম আনন্দ-বেদনার রূপকার। চৈতন্য-পূর্ববর্তী দুই কবি— জয়দেব আর বিদ্যাপতির বিস্তৃত কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় যে পরিশীলিত নাগরিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় চণ্ডীদাস তার বিপরীত। তিনি গ্রামীণ কবি। কিন্তু তাঁর গ্রামীণতা বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রাম্যতা নয়। বাংলার পল্লীজীবনের রূপ, রং ও রস, তার বর্ণবিরল সহজ প্রগাঢ় শ্যামলিমা নিয়ে চণ্ডীদাসের পদে উপস্থিত। চণ্ডীদাসের কাব্য রাধাময়। তাঁর 'গোরোচনা গোরী' রাধাও বাঙলা দেশেরই এক লোকলজ্জাভীতা কুলবধূ। কিন্তু তাঁর অসাধারণত্ব কৃষ্ণপ্রেমের বিশিষ্টতায়। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এই কৃষ্ণপ্রেমেরই জন্য রাধা-হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি আর যন্ত্রণা। সামন্ত-সমাজের পটভূমিতে এক বাঙালি গৃহবধূর গণ্ডি বদ্ধ জীবনের নিরুপায় বন্দিত্বে, পরিবার-পরিজনের অরণ্যে একাকিনী রাধা কখনো প্রেমের বেদনায়, কখনো গৌরবে, আবার কখনো বা নিজের দ্বিধান্দোলিত সত্তার ব্যাকুলতায় ব্যথাদীর্ণ। চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলী যেন সেই রাধার হৃদয়-নিংড়ানো অশ্রুবিন্দু দিয়ে গাঁথা মুক্তামালা, ধূসর গোধূলির মত ম্লান— অসংজ্ঞেয় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। পূর্বরাগ থেকে মাথুর এবং অবশেষে নিবেদন— সর্বত্রই সেই মুক্তাবিন্দুর শুভ্রতা, সেই বিষণ্ণতার গোধূলিম্লান ছায়া।

[খ]

বিদ্যাপতির নাগরিকা রাধা বয়ঃসন্ধির বিচিত্র স্তর অতিক্রম করে অবশেষে কৃষ্ণপ্রেমিকায় পরিণত হয়েছেন। অন্যদিকে চণ্ডীদাসের পদে আমরা কৃষ্ণরূপ দর্শনে মুগ্ধ আবিষ্ট রাধাকে প্রথম থেকে দেখতে পাই। কৃষ্ণকে দেখে রাধার মুগ্ধতা ও বিস্ময়কে কবি একটি পদে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যমুনার জল আনতে গিয়ে নীপতরুর মূলে কৃষ্ণকে দেখে রাধার ধৈর্য বিলুপ্ত হয়। কৃষ্ণের মধুর হাসিতেও রাধার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়— 'জাতি কুল শীল, সব তিয়াগিএল/হইব কানুর দাসি'।

Scanned with CamScanner

পূর্বরাগ পর্যায়ে শুধু রাধার কৃষ্ণানুরাগ নয়, তারই সঙ্গে ফুটে উঠেছে গ্রাম বাংলার নানা লৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাসে ভরা অন্তঃপুরিকাদের ছবি। রাধাকে দেখে সখীদের মনে হয়েছে কোন অপদেবতা তাঁর ওপর ভর করেছে। কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে গেলে রাধা সখীদের গলা ধরে কাঁদতে থাকেন। রাধার বাণীহীন ক্রন্দনের এই চিত্রটিতে তাঁর প্রেমের গভীর যন্ত্রণা এবং সেই যন্ত্রণাকে তাঁর একাকী বহন করতে না পারার নিরুপায়তা প্রকাশ পেয়েছে। পদাবলীর চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদেও বৃদ্ধা বড়াইর উল্লেখ আছে। তিনি এখানে প্রেম-সহায়িকা নন বরং অবৈধ প্রেমের জন্য প্রথম থেকেই রাধাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু এই সমস্ত গঞ্জনায় রাধার কৃষ্ণপ্রেম ম্লান হয় না। বরং আরও প্রগাঢ় আরও গভীর হয়ে ওঠে। 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা' শীর্ষক পদটিতে কৃষ্ণপ্রেম মগ্না রাধা পরিবার-পরিজনের ভীতি এবং লোকনিন্দার বহু ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয়ে সাধিকা যোগিনীতে পরিণত হন। মরমিয়া কবি চণ্ডীদাসের ভক্ত ও প্রেমিক হৃদয়ের সর্বস্ব নিঙড়ানো ভালবাসার রঙে আঁকা সেই রাধা—

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা॥
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

শ্রীরূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি-তে ব্যভিচারীভাবের উদাহরণ দিতে গিয়ে পদাবলী থেকে অজ্ঞাতনামা একজন কবির শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। সেই শ্লোকটিতে 'আহারে বিরতিঃ সমস্ত বিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা' প্রেমিকের যোগিনীমূর্তি চণ্ডীদাসের এই পদটির কথা মনে করিয়ে দেয়। 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার' শীর্ষক পদটিতেও কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধার তীব্র অস্থিরতার ছবি। কবিতার ধ্বনি এখানে নূপুরবহী। 'কাহারে কহিব মনের মরম' শীর্ষক পদটিকে ড. বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্য-পূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের বলে নিঃসংশয়ভাবে গ্রহণ করেননি। সজনীকান্ত দাসের প্রাচীন পদসংগ্রহের পুঁথিতে পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া গেছে। এখানে রাধার নিজেরই মুখে নিজের কৃষ্ণানুরাগের বর্ণনা। শুধু রূপদর্শনেই নয়, কৃষ্ণনাম শ্রবণেও রাধার অন্তরের আশ্চর্য রূপকার এই গ্রামবাংলার কবি। 'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম' শীর্ষক পদটিতে আমরা নামমুগ্ধা রাধার সেই ছবিই দেখতে পাই। এই পদটিও চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের কিনা সে সম্বন্ধে বিমানবিহারী মজুমদার সন্দেহ পোষণ করেছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু এটিকে চৈতন্যপরবর্তী দীন চণ্ডীদাসের পদ বলে মনে করেছেন। কারণ, এতে বিদগ্ধমাধবের 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং' শ্লোকটির প্রভাব আছে। কিন্তু অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর মতো এটি চৈতন্যপূর্ববর্তী রচনা, পূর্বরাগের একটি সহজ সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত পদ। রূপগোস্বামীর লেখা অনুসরণে রচিত নয়। শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের এই সমস্ত পদের সঙ্গে ভক্তপণ্ডিত শ্রীরূপ গোস্বামীর পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বলা যায়, শ্রীরূপ গোস্বামীই পদটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। পদটির 'না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো' পংক্তিটির আক্ষরিক অনুবাদ হল—'নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী'। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, চণ্ডীদাসের বাংলা পদে আছে শ্যাম নাম, আর রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত শ্লোকে আছে 'কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী'। শ্যাম শব্দের ব্যবহার চৈতন্যপূর্ব যুগের।

অন্যদিকে 'কৃষ্ণ' শব্দটি চৈতন্যদেবের কৃষ্ণনামমন্ত্র প্রচারের ফলেই বৈষ্ণব পদে সর্বাধিকভাবেই স্থান পেয়েছে। এই যুক্তি দিয়েও আমরা পদটিকে চৈতন্যপূর্ববর্তী বলে গ্রহণ করতে পারি। চৈতন্যপূর্ব বিদ্যাপতির পদেও কৃষ্ণের নামশ্রবণবিহ্বলা মূর্ছিতা রাধার চিত্র পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি তাঁর কবি হৃদয়ের বর্ণনাতেই হয়তো এই রাধার সন্ধান পেয়েছিলেন, আর চণ্ডীদাস নিজেই ভাবতন্ময় মরমিয়া কবি। তাই তাঁর রাধা কৃষ্ণনাম শ্রবণে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। 'নয়ান পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ'। 'কাহারে কহিব মনের মরম' শীর্ষক পদটিতে পূর্বরাগের কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধার বেদনাহত হৃদয়ের নিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এখানে পূর্বরাগ পর্যায়েই রাধার কৃষ্ণপ্রেমের যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে তাঁকে উন্মনা করে তোলে। আত্মজনদের মধ্যেও রাধা একাকিনী, অথচ তিনি নিরুপায় বটে। তাঁর পারিপার্শ্বিকের সর্বত্রই বাধা যার বন্ধু কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণদর্শনের সুযোগবঞ্চিতা নুকিয়ে রাধাকে রাখে ঘরে। অথচ উজ্জ্বল নীলজলদ কৃষ্ণের রূপের সাদৃশ্য দেখেই যেন রাধার প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে। এমনি রাধার হৃদয়ের পরিচয় গোপনহীন নয়। এমনই প্রতি মুহূর্তে রাধার অন্তরের নিগূঢ় আবেগে আলোড়িত করে। শেষপর্যন্ত যেন নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের জন্য সমস্ত সামাজিক গ্লানি ও কলঙ্কের সম্ভাবনাকে মনে রেখে রাধা তা গ্রহণ করেন। কিন্তু সবার আগে এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটি বাক্যটি রাধার দীর্ঘ সংগ্রামের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা, তাঁর বেদনা বহন অন্তরের শেষ সীমায় উচ্চারিত। অথচ গোটা পদটির প্রকাশভঙ্গি কত সহজ ও আন্তরিক। তাই পূর্বরাগের এই পদটি রাধার সহজ ভালবাসার একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হিসেবেই আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। 'এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি' শীর্ষক পদটিতে শুধু রাধার প্রেমাতিশয্যের গভীর প্রেম নয়, রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক প্রেমসম্পর্কের অতুলনীয়তার দিকেকবি নিজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের প্রেম তিনি আগে কখনো দেখেননি, শোনেননি। দুজনের প্রাণই যেন দুজনের প্রাণে বাঁধা। অনুক্ষণ সান্নিধ্যে থেকেও এই প্রেম বিচ্ছেদের আশঙ্কায় সদা ক্রন্দন। তিলার্ধ পরস্পরকে না দেখলে তাঁরা মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা অনুভব করেন। প্রকৃতিজগতের যে প্রেমিকযুগলেরা আছেন প্রেম সম্পর্কের নিবিড়তায় কবিদের উপমার আদর্শ, এই প্রেমের তুলনায় সেই দৃষ্টান্তগুলির অকিঞ্চিৎকরতাকে কবি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন। সূর্য আর পদ্ম, চাতক আর মেঘ, ফুল আর ভ্রমরের দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যায়, শীতে পদ্ম মরে পড়লেও সূর্য ম্লান থাকে। চাতক যতই তৃষ্ণার্ত থাক না কেন, যদি বর্ষণের সময় না হয় মেঘ তাকে এক ফোঁটাও জল দেয় না। আর অসময়েই ফুলের কাছে যেতে হয়। ফুল কোনদিন এগিয়ে এসে ভ্রমরকে মধু দেয় না। তাই চণ্ডীদাসের মতে এই প্রেম পৃথিবীতে অতুলনীয়।

কখনো কখনো কুলবধূ গৃহবন্দিনী রাধার গোপন ভালবাসা কৃষ্ণকে দেখার ব্যাকুল আগ্রহে নিজ গৃহ গণ্ডির মধ্যেই অস্থির উপায় উদ্ভাবন করে। আবার কখনো রাধা সখীকে ডেকে বলেন, কৃষ্ণকে ছাড়া তিনি এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবেন না। কারণ 'সে রূপ সাগরে, মন যে ডুবিল, সে গুণে বান্ধল হিয়া। সে সব চরিতে, মন যে পশিল, আনিব কি জন দিয়া।' চণ্ডীদাসের রাধা এখানে পূর্বরাগ পর্যায়েই আত্মনিবেদনের অনুভূতিতে মুগ্ধ। রাধার গৃহবদ্ধ জীবন কৃষ্ণকে ছাড়া অর্থহীন। তাঁর পূর্বরাগের পদেও কখনো কখনো বিরহ-বেদনার আর্তি হাহাকার হয়ে ওঠে। এই পূর্বরাগবতী রাধার গভীর প্রেম কখনো আবেগে অস্থির, কখনো বেদনায় বিধুর, আবার কখনো বা যোগিনীর বৈরাগ্যপূর্ণ শান্তসমাহিত সমাজসংসারের বন্ধন তুচ্ছকারী আত্মার গভীরতম লোকে অবগাহী।

[গ]

চণ্ডীদাস অভিসার পর্যায়ের পদ বেশি রচনা করেননি। তাঁর রাধা অভিসারে বেরুতে পারেন না। এই রাধা একান্তভাবেই বাঙলা দেশের শাশুড়ি-ননদী-শাসিতা কুলবধূ। তাঁর প্রেম শুধু বেদনা পাওয়ার জন্য, অন্তরের গভীর গহনে রক্তক্ষরণের তীব্র যন্ত্রণা অনুভবের জন্য। তাই চণ্ডীদাসের পদে কৃষ্ণই অভিসারে বেরিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতীক্ষাস্থল কোন নিভৃত নিকুঞ্জ নয়, রাধারই গৃহের অঙ্গিনা। বর্ষামুখর অন্ধকার রাত্রিতে কৃষ্ণ রাধার জন্য পথে বেরিয়েছেন। তাঁকে দেখে রাধা একই সঙ্গে কষ্ট আর আনন্দ— দুই-ই পাচ্ছেন। প্রবল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রিয়তম কৃষ্ণের কষ্ট রাধার মনে বেদনার উদ্রেক করেছে। আবার অন্যদিকে কৃষ্ণের প্রেমের বিশ্বস্ততা গভীরতা ও নিষ্ঠা রাধাকে আনন্দিতও করেছে। রাধার এই প্রিয়তম কৃষ্ণ আপনার সুখ দুখ করি মানে এবং রাধার দুখের দুখী। কৃষ্ণের এই কৃচ্ছ্রসাধনদীপ্ত ভালবাসাই রাধাকে সশঙ্কিতা করে তোলে। কৃষ্ণের প্রেমার্তি দেখে রাধা ভাবেন, তাঁর জন্য মাথায় কলঙ্কের ডালি বহন করতেও তিনি প্রস্তুত। এই পদটি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তেও আলোড়ন তুলেছে। তাই চণ্ডীদাসের রাধা সম্পর্কে কবি মন্তব্য করেছেন—"রাধা হাসিবে, কি কাঁদিবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। রাধা সুখে দুঃখে আকুল হইয়া পড়িয়াছে। শেষে রাধা এই মীমাংসা করিল, শ্যাম আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে, আমি শ্যামের জন্য ততোধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।"

চণ্ডীদাসের মিলনের কোন প্রত্যক্ষ পদ নেই। তাঁর রাধার প্রেম এত করুণ কোমল আর স্নিগ্ধ যে স্থূল দেহ-মিলন বর্ণনা কবিকে উৎসাহিত করেনি। কিন্তু মিলনের পরবর্তী আনন্দের বর্ণনায়— রসোদ্গারে চণ্ডীদাসের রাধা প্রেম-সুখের প্রাপ্তিতে উদ্ভাসিত। কিন্তু দেহকামনার উত্তরোল উল্লাস নয়, সেখানেও মধুর সান্নিধ্যের সৌরভ বিকীর্ণ।

[ঘ]

রসোদ্গারের পরই চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগে আত্মনিবেদনের নিবিড় আকুতি আর তাঁর রাধার আক্ষেপানুরাগে কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিকূল সর্ববিধ অবস্থার বিরুদ্ধে অশ্রুসজল অভিযোগ। 'যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে' শীর্ষক পদটিতে রাধা কৃষ্ণপ্রেমের জন্য নিজেকেই গঞ্জনা দিয়েছেন। কৃষ্ণপ্রেম তাঁর সমস্ত সত্তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে আছে যে, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তিনি কৃষ্ণের নাম নিতে চান না, অথচ তাঁর জিহ্বা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে। নাসিকাও শুধু শ্যামঅঙ্গের সৌরভটুকুই গ্রহণ করে। তাঁর দুটি কান শুধু কৃষ্ণের কথাই শুনতে পায়। এই নিরুপায়তাই রাধার প্রেম ও সেই প্রেমজনিত বেদনাকে একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে। 'কি মোহিনী জান বঁধু' শীর্ষক পদটিতেও রাধার আক্ষেপ উচ্চারিত হয়েছে কৃষ্ণের প্রতি। তিনি বলেছেন, অবলা নারীর প্রাণ নিতে কৃষ্ণের মতো পটু এমন আর কেউই নেই ; কৃষ্ণের জন্য রাধার ঘর হল বাহির, আর বাহিরই হয়ে গেল ঘর। পরকে তিনি আপন করলেন ; আর আপন তাঁর কাছে হল পর। রাত্রিদিনের ভেদাভেদও ঘুচে গেল। কিন্তু তবুও রাধা কৃষ্ণের প্রেম বুঝতে পারলেন না। স্রোতের শ্যাওলার মতো অবলম্বনহীন জীবন নিয়ে রাধা ভেসে চলেন। তাঁকে বন্ধু বলার মতো কেউ নেই। তাই শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু বরণের সংকল্পই রাধা গ্রহণ করেন। সর্বপরিত্যাগী দুঃখিনী রাধার কৃষ্ণের অবহেলার তীব্র অভিমান, আর সেই

অভিমানে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকেই শাস্তি দেওয়ার জন্য মৃত্যুসংকল্প ঘোষণা সরলা পল্লীবধূ রাধাকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

আক্ষেপানুরাগে কবি চণ্ডীদাসের প্রতিভার চরম বিকাশ। কবি হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা, বাঙলা দেশের গ্রামীণ সমাজ এবং তারই সঙ্গে কবির নিজস্ব ধর্মবোধ— সমস্ত কিছুই রূপায়িত হয়েছে আক্ষেপানুরাগের পদে। এত বাধাবিঘ্ন আর প্রতিকূলতার মাঝখানেও রাধার প্রেমের দীপশিখাটি জ্বলেছে উজ্জ্বল দীপ্তিতে। পল্লীবাংলার একটি পরিবারের বধূরূপে সমাজভীতি ও সতীত্ববোধের দৃঢ়মূল সংস্কারে বন্দিনী রাধার বেদনা বড় মর্মস্পর্শী। একদিকে অনিবারণীয় কৃষ্ণপ্রেমের বহির্মুখী আকর্ষণ, আর অন্যদিকে অন্তঃপুরের পরিজনভীতি আর সংস্কার— উভয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত রাধার বেদনাই ফুটে উঠেছে চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে। শুধু নিজের প্রতি আর শ্যামের প্রতি নয়, জড় অচেতন বাঁশীর প্রতিও রাধার আক্ষেপ উচ্চারিত হয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর রাধা-চন্দ্রাবলীর মর্মছিন্নকারী কৃষ্ণবিরহের আর্তনাদ বাঁশীর সুরের প্রতিক্রিয়াতেই জেগে উঠেছিল। আর চণ্ডীদাসের রাধাও বলেন, কৃষ্ণের বাঁশী দুপুরে ডাকাতি করে তাঁর কুলধর্ম, ধৈর্য, সতীত্বধর্ম আর লজ্জা—সব কিছুই হরণ করে নিয়ে যায়। সেই বাঁশীর সুরে সতী ভুলে যায় নিজের স্বামীকে, মুনিরও মন ভোলে—এমনকি তরুলতারাও পুলকিত হয়। রাধার নিভৃত মন্দিরের নিরুদ্ধ কক্ষে বাঁশীর সুর গিয়ে পৌঁছোয়। সেই সুরে ওঠে রাধার নাম। সেই সুরের মোহনিয়া ফাঁদে বন্দিনী রাধা অনর্গল অশ্রুজলে সিক্ত হতে হতে ভাবেন— 'বাঁশী কেনে ডাকে ,থাকি থাকি।' বাঁশীর বিরুদ্ধে রাধার হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা এই বেদনাময় অভিযোগ, আর রাধার অসহায় আত্মসমর্পণের ভাষা শুনে মনে হয়, বাঁশী যেন জড় নয়— একটি জীবন্ত বস্তু। কামোন্মাদ-যক্ষের আত্মবিস্মৃতি এখানে প্রেমোন্মাদিনী রাধারও ঘটেছে। 'ধরম করম গেল গুরু গরবিত' শীর্ষক পদটিতে রাধা তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি আক্ষেপ উচ্চারণ করেছেন। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই ধরনের পদগুলি সম্পর্কে বলেছেন—"এহেন পিরীতির গঞ্জনামূলক পদগুলিকে গঞ্জনা না বলিয়া বন্দনা বলাই ভাল। তবে গঞ্জনার ভঙ্গি কেননা, গঞ্জনার মধ্য দিয়া শত্রুভাবে পিরীতির অর্চনা।"[১] কৃষ্ণের প্রেম রাধাকে অবশ করেছে। ঘরে-বাইরে প্রত্যেকেই তাঁর নামে নানা অপবাদ দিচ্ছে। রাধার আক্ষেপ— 'কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী'। এই কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্ক নিয়ে চিন্তা করতে করতে রাধা শেষ পর্যন্ত ব্যাধিগ্রস্তই হয়ে পড়লেন। কিন্তু এই ব্যাধি যে কাঙ্ক্ষিত, চণ্ডীদাসের ভণিতাতেই তার পরিচয় আছে। তিনি বলছেন, যেহেতু রাধার শরীরে মনে এই ব্যাধি ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেহেতু রাধা শীঘ্রই সুস্থিত হবেন। 'পিরিতি সুখের সায়র দেখিয়া' শীর্ষক পদে আবার প্রেমকে রাধা তুলনা করেন পল্লীবাংলার একটি সরোবরের সঙ্গে। প্রেমকে সুখের সায়র ভেবে রাধা সেখানে স্নান করতে নেমেছিলেন। স্নানের পর তীরে উঠতেই তাঁর গায়ে লাগল দুঃখের বাতাস। প্রেমসরোবরের নির্মল জলের ভেতরে বাস করে দুঃখের মকর, গুরুজনদের গঞ্জনা যেন জলের শ্যাওলার মতো— রাধার স্বচ্ছন্দ স্নানকে ব্যাহত করে। প্রতিবেশীদের নিন্দা জিওল মাছের মতো রাধাকে যন্ত্রণা দেয়। আর বংশমর্যাদা যেন পানিফলের কাঁটার মতোই প্রেমসরোবরের জলকে বেষ্টন করে থাকে, আর কলঙ্করূপ পানা সবসময়ই গায়ে লেগে কুট্‌কুট্‌ করে। চণ্ডীদাস ভণিতায় রাধাকে বলেন, সুখ আর দুঃখ যেন দুটি ভায়ের মতো। তাই 'সুখের লাগিয়া, যে করে পিরিতি/দুখ যায় তার ঠাঞি'। শুধু সুখের জন্য প্রেম

১. *চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*—শঙ্করীপ্রসাদ বসু (২য় সং), পৃ. ৮৯

Scanned with CamScanner

করলেও দুঃখ সঙ্গে সঙ্গে আসবেই। চণ্ডীদাসের এই ভণিতায় শুধু রাধার প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ পায়নি, ফুটে উঠেছে জীবনের করুণ অমোঘ সত্য। বাংলার গ্রামীণ পরিবেশের একটি নিতান্ত তুচ্ছ উপাদানকে অবলম্বন করে রাধার পিরীতির স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে অন্তঃস্পর্শী জীবনবোধের শিল্পরূপে।

'বন্ধু সকলি আমার দোষ' শীর্ষক পদটিতে একই সঙ্গে রাধা নিজের প্রতি এবং প্রেমের প্রতি আক্ষেপ উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলছেন, না জেনে প্রেম করেছেন। সুতরাং কাউকে দোষ দেওয়ার কিছুই নেই। কৃষ্ণপ্রেমকে 'অমৃত-সমুদ্র' ভেবে তিনি তা পান করলেন। কিন্তু সেই অমৃতই তাঁর ভাগ্যে গরল হয়ে গেল। তিনি যদি সামান্য আভাসেও জানতেন যে এমন পরিণতি হবে, তা হলে এই কাজ তিনি করতেন না। এখন তাঁর জাতি, কুল এবং চরিত্র—সবই গেছে। অবিরাম চোখের জল ফেলা ছাড়া তাঁর অন্য কোন উপায় নেই। কৃষ্ণের সঙ্গে যে তাঁর প্রথম প্রেম, সেই প্রেমের তিন ভাগের এক ভাগও এখন অবশিষ্ট নেই। যার জন্য রাধা মরতেও প্রস্তুত, সেও যদি পর করে দেয় তাহলে দুঃখের আর অবধি থাকে না। রাধার এই আক্ষেপের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি তীব্র গূঢ় অভিমানও প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণপ্রেমের ক্রমবিলীয়মানতা সম্পর্কে রাধার আশঙ্কাই এই অভিমানের জনয়িতা। কিন্তু এই অভিমানের প্রকাশে এক ধরনের শান্ত নির্বেদ যেন আপাত নির্লিপ্তির আড়ালে রাধার বেদনাকে আরও তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। কখনো বা রাধা নিজের পরাধীন জীবনের জন্য, পরবশ হওয়ার জন্যই তাঁর প্রেমের ব্যর্থতা একথা মুক্তকণ্ঠেই বলেন। 'ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীনী জীয়ে' শীর্ষক পদটিতেও রাধা একই কথা বলেছেন। অমৃতের সমুদ্র তাঁর ভাগ্যে বিষ হয়ে গেল। শীতল ভেবে তিনি পাষাণ কোলে নিলেন। কিন্তু রাধার দেহেরই তীব্র আগুনে সেই পাষাণ গলে গেল। ছায়া দেখে তিনি যদি তরুলতায় ছায়াচ্ছন্ন বনে গিয়ে বসেন তবে সেখানে দাবানল জ্বলে ওঠে। যমুনার জলে গিয়ে ঝাঁপ দিলে প্রাণ শীতল হওয়ার পরিবর্তে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত রাধা সিদ্ধান্ত নেন, তিনি বিষপান করেই আত্মহত্যা করবেন। কুলবধূ রাধার ভালবাসার এই নিরুপায় যন্ত্রণা অন্য কোন কবির পদে এত জীবন্তভাবে ফুটে ওঠেনি। কখনো আবার চণ্ডীদাসের রাধা বিধাতার প্রতি তাঁর তীব্র আক্ষেপ উচ্চারণ করেছে। 'ধাতা-কাতা বিধাতার বিধানে দিলাম ছাই' শীর্ষক পদটিতে তারই প্রকাশ। রাধা বিধাতাকে গঞ্জনা দিয়েছেন কৃষ্ণের মতো 'মূঢ় মুরুখের' সঙ্গে তাঁর প্রেম ঘটানোর জন্য। কৃষ্ণের জন্য রাধার প্রাণ কাঁদে। কিন্তু তাঁর আর দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত চণ্ডীদাসের রাধা নিরুপায়ভাবে বলেন যে ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তিনি দূরদেশে চলে যাবেন। এখানেও নিরুপায় যন্ত্রণাবোধ থেকেই রাধা অসহায়ভাবে এই কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন। চণ্ডীদাসের রাধা শুধু নিজেকেই শাস্তি দিতে পারেন। আর এইভাবেই তাঁর দুঃখ-দহনদীপ্ত প্রেমিকা-হৃদয়ের ক্ষতচিহ্ন উন্মোচিত হয়। 'সই ডাকিয়া শুধাইতে নাই' শীর্ষক পদটিতে রাধা সখীকে সম্বোধন করে তাঁর নিজের দুঃখের কথা বলেছেন। এখানেও রাধার সেই একই অভিযোগ। পৃথিবীতে প্রেম সবাই করে, কিন্তু রাধা আর কৃষ্ণই শুধু দোষী হন। প্রেমের জন্য আজ সারা পৃথিবী রাধার শত্রু। রাধা সখীকে আরও বলেন 'তোমরা পরাণের বেথিত আছিলা, জীবনে মরণে সঙ্গ'—কিন্তু সেই সখীদের ত্যাগ করে রাধা ইচ্ছে করেই কৃষ্ণপ্রেমকে নিজের জীবনে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু আজ সেই প্রেমের জন্যই রাধার নিন্দার অবধি নেই। এখনও যদি রাধা প্রাণত্যাগ করেন, তা হলেও সখীরা হয়তো তাঁকে ডেকে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করবেন না। ভণিতায় চণ্ডীদাস বলছেন, কৃষ্ণ যদি রাধার আপন হন, তা হলে রাধা সবাইকেই পাবেন। এখানেও রাধার অভিমানবাণী কৃষ্ণের প্রতি, সেই

সঙ্গে নিজের শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশের মত সখীর প্রতিও উচ্চারিত হয়েছে। আক্ষেপানুরাগের এই পদগুলিই প্রমাণ করে কৃষ্ণপ্রেম রাধার প্রাণ, তাঁর দ্বিতীয় অস্তিত্ব। কিন্তু সমাজ-শক্তির রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করার সামর্থ্য এই কুলবতী রাধার নেই। বড়ু চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির রাধা নিজেদের রূপযৌবন আর বংশমর্যাদার জন্য যথেষ্ট গর্বিত। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার নিজের সম্পর্কে লেশমাত্র গর্ব নেই। তিনি তাঁর সমাজ-কুল, পরিবার—সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তির হাত থেকে অন্তরের নিভৃতে কৃষ্ণপ্রেমকে সযত্নে সঙ্গোপনে বাঁচিয়ে রাখতে চান, কিন্তু পারেন না, ব্যর্থ-বেদনায় বারবার ভেঙে পড়েন। তাই রাধার মুখে পিরীতির এত ব্যাখ্যা, এতবার প্রেম-যন্ত্রণার কথা সখীকে ডেকে শোনানো, ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে পরিবারের তথা সমাজ-শক্তির তীব্র দ্বন্দ্ব। রাধার নিজের সামাজিক সত্তার সঙ্গে তাঁর অন্তরের গভীর-গহনের প্রেমিকসত্তার দ্বন্দ্বই ফুটে উঠেছে এই সব পদে। 'পিরীতি' এই তিনটি অক্ষরের শক্তি কি ভীষণ, আকর্ষণ কি তীব্র, মধুর ও অপ্রতিরোধনীয়— তারই প্রকাশ ঘটেছে রাধার পিরীতি-বন্দনায়, পিরীতি-গঞ্জনায়। আক্ষেপানুরাগের এই পদগুলি থেকে চণ্ডীদাস-রামীর প্রেম-সম্পর্কের কিংবদন্তীর সত্যতা যেন অনুভব করা যায়। 'পিরিতি পিরিতি কি রীতি মুরতি' শীর্ষক পদটি রাধার পিরীতি-গঞ্জনার ছদ্মবেশে অপরূপ পিরীতি বন্দনা। রাধা জানেন না এই প্রেমের কি মূর্তি। শুধু প্রেম তাঁর হৃদয়ে লেগে থাকে, প্রাণ ছেড়ে দিলেও পিরীতি রাধাকে ছাড়ে না। রাধা জানেন না এই পিরীতি কে নির্মাণ করেছে। পিরীতি—এই তিনটি অক্ষর যে কোথায় ছিল, তাও রাধা জানেন না। এই না-জানার বিস্ময়ে, অভাবিতের চমকে রাধার প্রেম রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। এই প্রেম যেন পার্থিব হয়েও পার্থিব নয়। কোথায় তার উৎস, রাধা তা নিজেই জানেন না। প্রেম যেন কাঁটার মতো রাধার হৃদয়ের ভেতরে যেখানে প্রাণের পুতুল, সেখানেই গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে। 'পিরিতি' শব্দটি রাধা বারবার উচ্চারণ করেন। তাঁর অস্তিত্বের চারপাশে এই প্রেম যেন আগুন জ্বেলে দেয়। কিন্তু সেই আগুন কোন সময়ই নির্বাপিত হয় না ; রাধার হৃদয়ে শেলের মতো বিঁধে থাকে। চণ্ডীদাসের রাধার এই আক্ষেপ পূর্বরাগ পর্যায় থেকে শুরু করে নিবেদন পর্যন্তই বিস্তৃত। হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ করে যে প্রেম, যে প্রেম শেলের মতো বিদ্ধ হয়— রাধাকে আঘাত করে তাঁর দিনযাপনের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে বেদনার রক্তবিন্দু ঝরায়, সেই প্রেমই কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার তথা চণ্ডীদাসেরও সর্বস্ব। তাই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবধারিত যে আশ্রয়, সেই আশ্রয়ের জন্য তিনি পরিকল্পনা করেন পিরীতি নগরের। পিরীতির সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করতে পিরীতি-লাঞ্ছিত পতাকা উত্তোলনের সংকল্পও তাঁরই। রাধার এই বিষামৃতময় প্রেম, অস্তিত্বের অনলজ্বালা—সলিলসিক্ত এই সারসুরভির মধুর দহনে দুর্মোচ্য ক্ষতের প্রলেপ রূপে উচ্চারিত। চণ্ডীদাসের সান্ত্বনার যে স্নিগ্ধকণ্ঠ, হয়তো তা শুধু রাধাকে নয়, নিজেকেও লক্ষ্য করে।

পিরিতি নগরে বসতি করহ
থাকহ পিরিতি মাঝে।
সকল তেজিয়া পিরিতে মজহ
কি করে লোকের লাজে॥
পিরিতি বলিয়া নিশান তুলিয়া
দাও না ভুবন ভরি।
পিরিতি রসের কলঙ্ক পাইলে
বিলম্ব নাহিক করি॥

Scanned with CamScanner

চণ্ডীদাসের খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা রাধার বেদনা এবং কৃষ্ণকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করার ক্ষমতা—দুই-ই সমপরিমাণে সত্য। এই রাধার কণ্ঠেই আমরা কৃষ্ণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাধার প্রতিবাদ উচ্চারিত হ'তে শুনি। কিন্তু এই বিদ্রোহবহ্নিমা চণ্ডীদাসের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই শেষ পর্যন্ত রাধার নম্র ভালবাসায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব স্ফুরিত হয় নিবেদনে। গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

চণ্ডীদাসের রাধাও একইভাবে কৃষ্ণকে বলেছেন 'সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী।' কিন্তু রাধার ভক্তির মধ্যে ঐশ্বর্যভাব বিন্দুমাত্র নেই। তাঁর কৃষ্ণপ্রেম তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল। তাই রাধা 'বঁধু কি আর বলিব' শীর্ষক পদটিতে বলেন, জন্মে-জন্মে, জীবনে-মরণে কৃষ্ণ সবসময়ই তাঁর 'প্রাণনাথ'। সমগ্র বৃন্দাবনে শ্বশুরকুলে, পিতৃকুলে—কোন কূলেই রাধার কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নেই। ত্রিভুবনে তিনি কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে আপন বলে ভাবতে পারেন না। তাই রাধা বলেন—'শীতল বলিয়া শরণ লইনু ওদু'টি কমল পায়।' 'বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ' শীর্ষক পদটিতেও রাধা অখিলের নাথ, যোগীর আরাধ্য কৃষ্ণের কাছে 'পিরীতি রসে' তনুমন ঢেলে কৃষ্ণের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেন। সামাজিক জীবনের কলঙ্কের গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের কলঙ্ক অলঙ্কার করে গলায় পরে তিনি আনন্দ পান। তিনি সতী কি অসতী, সে বিচারের ভারও তিনি কৃষ্ণের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। এই পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন চণ্ডীদাসের রাধারই একান্ত বৈশিষ্ট্য। চণ্ডীদাসের এই নিরাভরণ পদগুলির মধ্যে রাধার হৃদয়ের নিঃশেষ সমর্পণের সুর যেন স্নিগ্ধ চন্দন-বাসিত। চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগ হৃদয়মথিত বেদনার সুর, মিলনের আনন্দেও প্রেমবৈচিত্র্যের সশঙ্ক বেদনা। আক্ষেপানুরাগে সমাজ পরিবার ও প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সত্তার আর্ত হাহাকার। বিরহ পর্যায়েও সেই অনির্বাণ বেদনা-ধারার অবিরল প্রবাহ। কিন্তু অবশেষে নিবেদনের পদে রাধার অশ্রু-স্রোতস্বিনী যেন কৃষ্ণ-সমুদ্রের মাঝখানে বিলীন। এই সমর্পণেই তাঁর শান্তি, তাঁর বিশ্রাম, তাঁর দ্বিধা-বিভক্ত সত্তার যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি। কিন্তু এই কবির রাধা বড় ভীরু। হতভাগ্যের মতো নিজের সৌভাগ্যে অবিশ্বাসী। তাঁর মনে ভয়, আবার কোন্ অতর্কিতে বাধা আসবে, আবার বাজবে বিচ্ছেদের করুণ রাগিণী। তাই জয় করেও তাঁর ভয় যায় না। তিনি কাতরভাবে বলেন 'না ঠেলহ ছলে, অবলা অবলে/ যে হয় উচিত তোর।' অন্য নায়িকাবিলাসী কৃষ্ণের প্রতি রাধার ব্যঙ্গমিশ্রিত বাক্যবাণ এখন হারিয়ে গেছে। তিনি কৃষ্ণকে অনুনয় করে বলেন—'বঁধু ভিন্ না বাসিও তুমি/পতি-গুরুজন এঘর করণ/সকল ছাড়্যাছি আমি।'

[৬]

বিরহ পর্যায়ে খণ্ডিতা-কলহান্তরিতা রাধার অভিযোগ নেই, বেজে উঠেছে হাহাকার। সমস্ত বিরহের পদেই একদা প্রিয়-মুগ্ধা প্রিয়সন্নিধ্যে আনন্দিতা রাধার তীব্র বেদনাই অনুরণিত। 'শুন শুন ওগো মরম সখি' শীর্ষক পদটিতে রাধা সখীকে বলছেন, কৃষ্ণবিরহে তাঁর কাছে প্রতিদিনের ঘরকন্না বিষের মতো মনে হচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্যও রাধা স্বস্তি পাচ্ছেন না। তাঁর মনে হচ্ছে, এই ভাবেই কৃষ্ণের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি একদিন দেহ হারাবেন। তাঁর শয়নে, ভোজনে দু'টি আঁখি মুদ্রিত করে তিনি সর্বদাই কৃষ্ণের রূপমাধুরীর কথা ভাবছেন। কৃষ্ণের জন্য তাপিত

হৃদয় নিয়ে রাধা কোথায় যাবেন, তাও ভেবে পাচ্ছেন না। আজ তাই রাধার প্রশ্ন—'কে আছে এমন করয়ে শীতল/নন্দের নন্দন দিয়া।' কৃষ্ণের সান্নিধ্য বিরহতপ্তা রাধাকে যেন চন্দনের শীতল প্রলেপে শান্ত করে। ইন্দ্রিয় সংবেদনময় অথচ অনুগ্র, কামনাহীন এই বিরহার্তিও চণ্ডীদাসেরই রাধার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ভণিতায় চণ্ডীদাস তাঁর রাধাকে নিকট-মিলনের আশ্বাস দিয়েছেন। '(সখি) রাই, চিত নিবারণ কর' শীর্ষক পদটিতে কৃষ্ণবিরহে রাধা একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। কৃষ্ণকে ছাড়া রাধার শরীর ক্ষীণ হয়েছে। তিনি কথা বলতে পারছেন না। তাঁর সোনার মতো রঙ মলিন হয়েছে। চাঁদের মতো মুখ শুকিয়ে গেছে। দেখে শুনে সখীর মনে হচ্ছে, কৃষ্ণবিরহে রাধা প্রাণই হারাবেন। তাঁর সোনার মতো গায়ের রঙ্ মলিন হয়েছে, পাঁজর দেখা যাচ্ছে। সখীর মনে সংশয় দেখা দিয়েছে, এইভাবে কৃষ্ণবিরহে রাধা আর কতক্ষণ বেঁচে থাকবেন। কারণ যার 'অন্তরে বিরহ' সে আর কতক্ষণ বাঁচবে 'কতক্ষণ জীব রাই'। ভণিতায় চণ্ডীদাস বলছেন, রাধার কাছে তাঁর একটিই মিনতি—তিনি কৃষ্ণকে দর্শন ও স্পর্শ করতে পারবেন, খুব শীঘ্রই তাঁদের মিলন হবে। শ্রীরূপ গোস্বামী উত্তরকালে তাঁর *উজ্জ্বলনীলমণি*-তে বিরহের দশমী-দশার যে বর্ণনা দিয়েছেন, এখানে চণ্ডীদাসের রাধার সেই অবস্থাই দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন—'চণ্ডীদাসের পদে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ায় অমর প্রেমের দীপশিখা।'[১] চণ্ডীদাসের বিরহের এই পদটির প্রসঙ্গে মন্তব্যটির যাথার্থ্য যেন নিবিড়ভাবে অনুভব করা যায়। 'সাঁজে নিবাইল বাতি কত পোহাইব রাতি' শীর্ষক পদটিতে রাধা নিজেই কৃষ্ণবিরহে তাঁর বেদনার তীব্রতার বিবরণ সখীর কাছে দিয়েছেন। পদের প্রথম চারটি পংক্তিতে রাধার যন্ত্রণার তীব্রতা, তাঁর ভগ্নহৃদয়ের হতাশা বর্ণিত হয়েছে। এখন রাধার 'না হয় মরণ না রহে জীবন'। কৃষ্ণ-সান্নিধ্যবিহীন রাধার আর কোন আশা থাকবে না। এখন রাধাকে এইভাবেই অসহনীয় অবস্থায় সময় কাটাতে হচ্ছে। তাই রাধা সখীকে বলছেন যে তাঁর কপালে কি ছিল—যার ফলে তাঁকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে? কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্পলতা তিনি রোপণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে পত্রোদ্‌গম হল না, লতা শুকিয়ে গেল। জন্ম থেকেই রাধা সেই লতার মূলে ক্ষীর ও নীর সেচন করলেন, কিন্তু বিরহের তীব্র আগুন ক্ষীরের গৌরব ও নীরের গুণকে হরণ করে নিল। যার জন্য রাধা সব কিছু ছাড়লেন, তাঁর 'মন হইল বনবাসী', সেই কৃষ্ণকে কিন্তু রাধা পেলেন না। ভণিতায় চণ্ডীদাস বলেছেন—শেষপর্যন্ত কৃষ্ণের স্পর্শে রাধা সুখী হবেন। পদটিতে রাধা মিলনারম্ভেই, প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশের সূচনালগ্নেই তাঁর সীমাহীন বিরহের গাঢ়তাকে রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মিলন রজনীতে দীপময় আলোকিত উজাগর মুহূর্ত রাধার জীবনে কোন দিনই আসবে না, তাঁর দীপ নিভে গেছে সন্ধ্যাবেলায়, সেই দীপহীন দীর্ঘ রাত্রিযাপনের আশঙ্কায় রাধার হৃদয়ের বেদনা এখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। চির অন্ধকারের জগতে যার বাস, আলোকিত মুহূর্তের আনন্দকে সে কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু যার জীবনে দীপবিভাসিত উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি স্বল্পকাল স্থায়িত্বের পরেই স্মৃতি হয়ে যায়, তার জীবনের অন্ধকার অতল নিবিড়; রাধা সেই নিবিড় অন্ধকারবাসিনী স্মৃতি-জর্জরিতা আলোক-পিপাসু। কবি চণ্ডীদাস তাঁর আভরণহীন ভাষার মর্মভেদী ব্যঞ্জনায় এই রাধাকে পাঠক-হৃদয়ে সহমর্মিতাময় রসলোকে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিরহের এই তিনটি পদের ভণিতায় চণ্ডীদাস প্রবলভাবে আশাবাদী। সেই আশা দিয়েই সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন তাঁর রাধাকে। কারণ তিনি আর তাঁর রাধা অভিন্ন। ব্যক্তিজীবনের

১. *চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*—শঙ্করী প্রসাদ বসু (২য় সং), পৃ. ১১৬

Scanned with CamScanner

প্রেম-বেদনা তাঁর পদাবলীর সর্বত্র বিরহ-বিষণ্ণতাকে ব্যাপ্ত করে রেখেছিল। তাই প্রকৃত বিরহ পদের স্বল্পতা চণ্ডীদাসের কাব্যে লক্ষণীয়। তাঁর রাধাকে বিরহবেদনায় আতুর করে তোলার জন্য, আলাদা করে কৃষ্ণকে মথুরা পাঠানোর প্রয়োজন কবির ছিল না। হয়তো সেজন্যই প্রকৃত বিরহের পদ তিনি বেশি রচনা করেননি। চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত জীবনের পরকীয়া প্রেমে প্রতিনিয়ত বিরহের যে অকূল-বিস্তার, তারই জন্য হয়তো চণ্ডীদাস রাধাকে মিলনের গাঢ় বিশ্বাসময় আশ্বাস দিয়ে নিজেই আশ্বস্ত হতে চেয়েছেন।

[চ]

ভাবোল্লাস পর্যায়ের পদেও চণ্ডীদাসের কোমল বিষণ্ণ রাধা কৃষ্ণের কাছে তাঁর নিজের বেদনাকে শান্ত সমাহিতভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু তারও আগে কৃষ্ণের আগমনের সম্ভাবনায় আনন্দিতা রাধার অপরিমেয় উল্লাস তাঁর বিরহের তীব্রতাকে বুঝিয়ে দেয়। 'সই জানি কুদিন সুদিন ভেল' শীর্ষক পদটিতে রাধার সেই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। কিন্তু রাধার মানসলোকে কৃষ্ণ যখন রাধার সামনে এসেছেন, সেই কৃষ্ণকে সম্বোধন করে 'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে' শীর্ষক পদটিতে রাধা বলেন— তাঁর প্রাণ যদি চলে যেতো তা হ'লে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হ'ত না—'দেখা না হইত পরাণ গেলে'। একটি নিতান্ত সরল বাক্য। কিন্তু এরই মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে রাধার বিরহের অশ্রু, মিলনের প্রতীক্ষা। কৃষ্ণ ছাড়া অনর্থক অস্তিত্বকে কৃষ্ণ-মিলনের আশায় টিকিয়ে রাখা প্রতি-মুহূর্তের সংগ্রাম। অভিমান স্ফুরিত হয় পরবর্তী পংক্তিগুলিতে। নারী বলেই রাধা সব কিছু সহ্য করলেন। পাষাণ হলে বিদীর্ণ হয়ে যেত। এর পরও রাধা বলেন, তিনি দুখিনী, তাঁর দিন যে দুঃখে কাটবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষ্ণ ভাল ছিলেন তো? কোন দুঃখকেই রাধা দুঃখ বলে মনে করেন না। কৃষ্ণের মঙ্গলকেই তিনি নিজের মঙ্গল বলে মনে করেন, কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে তাঁর এতদিনের দুঃখ দূরে গেল। এখন প্রেমের কোন উদ্দীপন— কোকিল, ভ্রমর, মলয়পবন আর চাঁদ রাধাকে দুঃখ দিতে পারবে না। মানস-মিলনের এই অপরূপ চিত্রটি থেকে বৈষ্ণব কবি সান্ত্বনা পেতে পারেন। কিন্তু পাঠকের চিত্তপটে বিরহিণী রাধার অশ্রুম্লান বেদনাদীর্ণ মূর্তিটি চিরকালের জন্য এই পর্যায়ে আরও গাঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়।

[ছ]

অন্যান্য প্রাচীন বাঙালি কবির মতো চণ্ডীদাসের জীবনকথাও আমাদের অজানা। কিন্তু তাহলেও তাঁর কাব্যের বিপুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তাঁর জীবন সম্পর্কে নানা কিংবদন্তীমূলক কাহিনী। কখনো কখনো তাঁর রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের রজকিনী রামীর গভীর প্রেম-প্রসঙ্গ মিশে একাকার হয়ে গেছে— 'শুন রজকিনী রামি,/ ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া/শরণ লইনু আমি।' এই ভাব ও ভাষাকে চণ্ডীদাসের থেকে কিছুতেই পৃথক করা যায় না। দীর্ঘকাল প্রচলিত এই কিংবদন্তীর কোন সত্যতা ছিল না তাও জোর করে বলা যায় না। কারণ নরহরি চক্রবর্তী সংকলিত *গীতচন্দ্রোদয়*-এ কবি চণ্ডীদাসের পদ সংকলিত করে সম্পাদক চণ্ডীদাসকে শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রেম কাহিনীকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। নরহরি চৈতন্য সমকালীন। সুতরাং তাঁর এই তথ্যকে নিছক কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চণ্ডীদাস সহজিয়া সাধক। তাই তাঁর সাধন-সঙ্গিনী থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। নানুর

থেকে ছ'মাইল দূরে তেহাই গ্রামে রজকিনী রামী বা রামমণির বাস ছিল। জনশ্রুতি অনুসারে রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের বিচিত্র প্রেম-সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরে তিনি চণ্ডীদাসের সাধন-সঙ্গিনী হন। চণ্ডীদাস পরকীয়া সাধনের জন্য রামীর সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলেও প্রচলিত আছে। দীনেশচন্দ্র সেন রামী-চণ্ডীদাসের পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ককে নিজের কল্পনায় বাসুলীর দৈবাদেশের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের জীবন নিয়ে এইসব কিংবদন্তী যদি তথ্য নাও হয়, তবু সত্য। রবীন্দ্রনাথ, আর রবীন্দ্রনাথই-বা বলি কেন, সাধারণ রসজ্ঞ পাঠকের উপলব্ধিতেও ধরা পড়েছে— বৈষ্ণবের গান শুধু বৈকুণ্ঠের জন্য নয়। এর পেছনে অবশ্যই আছে প্রেমিক অথবা প্রেমিকার ব্যক্তিগত জীবনের সুগভীর অভিজ্ঞতার আনন্দ-বেদনা, বাসনার বিচিত্র ছায়া-নীহারিকা। তাই এই প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে চণ্ডীদাসের কবি-মানসের স্বধর্ম ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা অসম্ভব। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদের মধ্যেই শুধু নয়, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রামী-সম্পর্কিত পদগুলিতেও তাঁর প্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। চণ্ডীদাস এই প্রেম সম্পর্কে বলেন—

রজনী দিবসে হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।—
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা॥

রবীন্দ্রনাথ এই পদটিতে প্রকাশিত প্রেম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"দিবস-রজনী পরবেশে থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব। একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না। অর্থাৎ এ প্রেম বাহ্যজগতের দর্শন স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপ্নের ধন স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধ মাত্র প্রেম আর কিছুই নহে। যেকালে চণ্ডিদাস ইহা লিখিয়া ছিলেন ইহা সেকালের কথা নহে।" রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিতভাবে আরও বলেছেন—"কঠোর ব্রত সাধনা স্বরূপে প্রেমসাধন করা চণ্ডীদাসের ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সেভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে— সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে—পূর্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে, যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শ স্থল হইবে...তখন কবিরা গাহিবেন পিরীতি নগরে বসতি করিব,/পিরীতে বাঁধিব ঘর,/পিরীতি রাখিয়া পড়শি করিব,/তা বিনু সকলি পর।"[১] এইভাবে চণ্ডীদাসের ব্যক্তিজীবনের প্রেমের সঙ্গে তাঁর রাধাকৃষ্ণের প্রেম কবি রবীন্দ্রনাথের অনুভবেও একসঙ্গে মিশে গেছে। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন— চণ্ডীদাস রামীর প্রতি তাঁর প্রেমের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন 'তুমি হও পিতৃমাতৃ'। এইভাবে প্রেমিকাকে পিতা-মাতার মর্যাদা দেওয়া অস্বাভাবিক মনে হলেও চণ্ডীদাসের প্রেম অনুভবের যে উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করেছে সেখানে পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী ও বন্ধুর প্রেম একসঙ্গে মিশে গেছে। তাই এই একটি 'পিরীতি' সম্পর্কের মধ্যেই সমস্ত মানবিক মমতাময় সম্পর্কগুলি বাঁধা পড়েছে। রামায়ণে দশরথ কৌশল্যা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, কৌশল্যা তাঁকে মায়ের মতো, সখীর মতো ও দাসীর মতো সেবা করে থাকে। তারপর সেই কথা অনেক কবি অনেকভাবে বলেছেন। কিন্তু

১. *চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*—রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), ত্রয়োদশ খণ্ড পৃ. ৬৩৫

Scanned with CamScanner

চণ্ডীদাস যখন রামীকে বলেছেন 'তুমি হও পিতৃমাতৃ' তখন তিনি প্রাচীন সমাজকে নতুনভাবে প্রকাশ করেছেন। সেই মধ্যযুগে উচ্চ সামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও চণ্ডীদাস তাঁর রজকিনী প্রেমিকাকে সুস্পষ্ট করে বলেছেন—"তুমি রজকিনী আমার রমণী, তুমি হও পিতৃমাতৃ ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।" কবি তাঁর রাধার প্রেম বর্ণনায় যে সান্দ্র ছবি এঁকেছেন ব্যক্তিজীবনের এই পবিত্র প্রেমের মধ্যেই তার বীজ লুকিয়ে আছে।

চণ্ডীদাসের কাব্যে বিরহপর্বের স্বরূপ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তার কারণ চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ থেকে আত্মনিবেদন পর্যন্ত সর্বত্রই বিরহের করুণ বেদনা মাধুর্য ছড়িয়ে আছে। তাঁর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে থাকলেও রাধার পক্ষে বিরহে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। চণ্ডীদাসের ব্যক্তিজীবনের প্রেমে রজকিনী রামী ও কবির মধ্যে যে নিবিড় দূরত্ব থাকত তাঁদের মিলনে চিরকাল বাধ ঘটিয়ে এসেছে, সেই বোধই রাধাকৃষ্ণের প্রেমেও সার্বিক বিরহ বেদনা সঞ্চারিত করেছে। এইভাবেই ব্যক্তি-কবির জীবনসত্য ও তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সত্য একাকার হয়ে গেছে। মধ্যযুগের আর কোন কবির কাব্যে বোধ হয় ব্যক্তিজীবনের সত্য এমন করে কাব্য-সত্যে উত্তীর্ণ হয়নি।

[ছ]

চণ্ডীদাস যে সহজ ভাষায় নিজের গভীরতম ভাবকে প্রকাশ করেছেন, সেই ভাষা বাঙালিরই মুখের ভাষা। আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষায় যে সংগীত সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে চণ্ডীদাসের মধ্যেই তার সূচনা। চণ্ডীদাসের ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মুখের ভাষা হলেও এই ভাষা গভীরতম আবেগের মুহূর্তকে ধরতে পারে, হৃদয়ের নিগূঢ়তম সত্যকেও প্রকাশ করতে পারে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে বাংলা কবি-ভাষা নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের যে কৃতিত্ব চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব মধ্যযুগে তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাঁর সহজ সাধারণ পদগুলিতে দেশের বাঙালি জীবনের নিতান্ত গ্রামীণ রূপ, সমাজপতির শাসন, বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের বিভিন্ন সংস্কার নীতিবোধ, সতীত্ববোধ প্রভৃতি কেমন অনায়াসভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কি আশ্চর্য, এই কেবল সাদামাটা ভাষায় ধরে রাখা আপাতভুচ্ছ প্রকাশগুলিই রাধার নিবিড় যন্ত্রণার গভীর প্রেমকে প্রকাশ করতে পেরেছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার তীব্র আকর্ষণ প্রকাশ করার জন্য দীর্ঘবিস্তারিত পংক্তির প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিন-পরিচিত শব্দের সঙ্গে বিশেষ ধ্বনির প্রত্যয় যোগ করে, শব্দের নির্দিষ্ট শরীরে ঈষৎ পরিবর্তন এনে কবি চণ্ডীদাস তা সহজেই সাধন করেন। 'কালিয়া বঁধু', 'পরাণ-পাখী', 'কালো মানিকের মালা' ইত্যাদি শব্দ এর উদাহরণ।

আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আপাতসহজ রূপের পেছনে জটিল ভাব-আবর্তনের মতোই চণ্ডীদাসের কবিতার রূপ-পদ্ধতি। জীবনানন্দ যখন বলেন, 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে' তখন 'খুঁড়ে' এই নিতান্ত সাধারণ মৌখিক ভাষার ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি গোটা কবিতার আবেদনকে অনন্য তাৎপর্য দেয়। চণ্ডীদাসের কাব্যেও সেই মধ্যযুগেই ক্রিয়াপদের এই বিশিষ্ট ব্যবহার পদ্ধতি লক্ষ করা যায়। 'অন্তর বেদনা যে জন জানয়ে পরাণ বাঁটিয়া দি, চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর'—সাধারণভাবে এগুলি ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিপর্যয়। বাদবস্তু বা অনুরূপ কোন বস্তুকে বেঁটে দেওয়া যায় কিন্তু অন্তরের বেদনাকে বণ্টন করা যায় কি! এ কেবল চণ্ডীদাসের রাধাই পারেন। সুন্দরী রাধা নীল শাড়ী নিঙড়ে চলেন, কিন্তু তার সঙ্গে কৃষ্ণের হৃদয়কেও নিঙড়ে নিয়ে চলার ক্ষমতাও তাঁর

আছে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক বাংলা কাব্যের ভাষায় আমরা অনুরূপ ব্যবহার দেখেছি। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অনুরূপ ব্যবহার তাঁর কবিতাকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে। অথচ এগুলির মধ্যে সেই অর্থে কোন অলংকারিত নেই। 'নিঙাড়ি'—এই ক্রিয়াপদটি শাড়ির সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হতে পারে, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক তীব্র বিরহ বেদনার মাত্রাকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেয়। অবার অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহারেও চণ্ডীদাসের অসামান্য দক্ষতা আমাদের মুগ্ধ করে। 'চাঁচর কিশোরী বসিতে কিশোরী, কিশোরী শয়ন ঘরে। কিশোরী ভোজন কিশোরী পূজন কিশোরী পদের ধ্যান'—পদটির প্রতি পর্বে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বিচিত্র ব্যবহার চণ্ডীদাসের আগে আর কেউ দেখাতে পারেননি। শুধু ক্রিয়াপদই নয়, বিশেষ শব্দকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও চণ্ডীদাসের দক্ষতার কথা আমরা আগেই বলেছি, কিন্তু একইভাবে 'পীরিতি' ও 'আরতি' শব্দ দুটিকে ব্যবহার করে কবি যখন 'পিরীতি' ও 'আরতি' করেন, তখন আগের অর্থ আর থাকে না। দুটি শব্দই তার আভিধানিক সীমাকে অতিক্রম করে যায়। 'পীরিতি' শব্দের অর্থ আর কেবলমাত্র 'প্রেম' থাকে না, নিবিড়তম ভালবাসার সমরূপ হয়ে ওঠে এবং প্রেমের প্রতিশব্দ হিসেবে এই বিশিষ্ট শব্দের ব্যবহার কবিতার আপাত প্রতীকের শেষ-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দেয়। 'আরতি' শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আকাঙ্ক্ষা এবং বেদনার সুর। কিন্তু এটিই যখন রূপান্তরিত হয়ে 'আরতি'তে রূপান্তরিত হয় তখন প্রেমের সঙ্গে পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দৃশ্য-হৃদয়ের মিলন নির্দেশ করে। কিন্তু আমাদের সকলেরই শব্দকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত না করে, না ভেঙে-চুরে কবি যখন অনায়াস দক্ষতায় তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেন, তখন শুধু চণ্ডীদাসের প্রেম নয়, আবহমান বাংলা ও বাঙালি যেন তাঁর কাব্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে। হাট, হাটুরী, পাখি, পিঞ্জর, আগুন, ফাঁদ, ফাঁস, চন্দ্র, শঙ্খ, ঘর, শাপলা, জিয়ল মাছ, পানিফল, পদ্ম— এ সকলই বাংলা দেশের মানুষের একেবারেই মুখের ভাষা। অথচ চণ্ডীদাসের রাধার অস্তিত্বের সর্বাঙ্গে জড়ানো অসাধারণ প্রেম এই শব্দগুলিতেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যাপতি তো বটেই, এমনকি বড়ু চণ্ডীদাসও যখন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রীতিতে এবং জয়দেবীয় রীতিতে নায়ক-নায়িকার প্রেম-বর্ণনা এবং শরীর-বর্ণনায় লোভ সামলাতে পারেন না, তখন চণ্ডীদাসের রাধা হন 'গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী'। তাঁর প্রেম আঁধার ঘরের সাপের মতো অলক্ষিতে দংশন করে তীব্র বিষজ্বালায় সর্বাঙ্গে দহন জাগায়। তাঁর রাধা প্রেমের বেদনাকে গোপন করার জন্য 'ধুঁয়া'-র ছলনা করে কাঁদেন। এইভাবে চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষায় গ্রামবাংলা তার প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে তার ভাবসম্পদ আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শুধু ভাষার সাহায্যে এইভাবে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করাতে আর কোন কবিই পারেননি। চণ্ডীদাস প্রেমের স্বর্গলোক সৃজনের জন্য কোনো কঠিন অলঙ্কারবহুল রত্নখচিত আভরণকে ভাষা-রূপ দেননি। সমাজ-শাসনে বিক্ষুব্ধ, লাঞ্ছিত কবি তাঁর প্রেমকে রাধার প্রেমবেদনায় আরোপিত করেছেন। আর এই জন্যই চণ্ডীদাস বাংলা কবিভাষার জনক, একেবারে বাঙালির মুখের ভাষাকে কাব্য-ভাষায় উত্তীর্ণ করার ঐতিহাসিক শিল্পী।

॥ ৩ ॥

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

চৈতন্যপূর্ব এবং চৈতন্যোত্তর— উভয় যুগের পদাবলী সাহিত্যের অজস্র কবিকুলের মধ্যে উজ্জ্বলতম দুটি নাম নিঃসন্দেহে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভার কবি। সেই ঐশ্বর্যময় অভিজাত জীবনের অলঙ্কৃত ঔজ্জ্বল্য দীপ্তিময় তাঁর কাব্য। আর চণ্ডীদাসের